Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 _(Index Copernicus International)_

Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.01-09

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: http://www.thecho.in

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত ও বাংলা কবিতা : একটি বিশ্লেষণ

ড. মৃদুল ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার কলেজ, কোচবিহার

Abstract:

From the time of inception of Bengali Language poetry advanced in different ways. The influence of the language movement come to poetry in the twentieth century taking into account the happiness, sorrow, joy and sadness of life. However, the contribution of the language movement behind the birth of Bangladesh from East Pakistan is everlasting. After 1947, the military rulers of East Pakistan wanted to impose Urdu language upon Bengalee's of that country. Between 1949 and 1951, the demand for the status of Bengali language became stronger. At the beginning of 1952, the language movement became stronger. In an immediate response to the language movement, Mahbub-ul-Alam Chowdhury, the convener of the 'Sarbadaliya Vasha Samgram Parishad' in Chittagong, wrote the poem 'Kadte Asini, Fanshir Dabi Niye Esechi' on 22 February. From 1953 to 1999, 132 poems of 115 poets were compiled in the collection 'Ekusher Kabita' published by Bangla Academy. In independent India, the language movement took place on 19 May 1961 at Silchar in the Barak Valley. Many poems of the language movement have been written in this country keeping in mind the contribution of the language martyrs of Barak. Poets like Bijit Kumar Bhattacharya, Bimal Chowdhury, Chitra Gupta and others have encrypted various dimensions of the language movement in their poems.The immortal 21st February 1952 has influenced the language movement in these two Bengals. This research paper tried to reveal to some extent the contribution of Language Movement in Bengali poetry.

Key Words: 1952, Language Movement, language martyrs, Bengali poetry, Barak Valley.

সমগ্র সাহিত্যের ধারায় কবিতার প্রভাব বহুমুখী। মানব হৃদয়ের গহনতম অন্তর আর্তনাদের শিল্পিত প্রকাশ হল কবিতা। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কবিতার বহুমাত্রিকতার প্রমাণ মিলেছে বারবার। মানুষের সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বিষাদে, বিদ্রোহে-বৈপ্লবিকতায় রাজনীতি-সমাজচিন্তা কিংবা প্রেমের প্রকাশের কবির নিত্য সহচর কবিতা। কবি হৃদয়ের একান্ত আত্মভাবনার একক চিন্তনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হল কবিতা। কিন্তু প্রকাশের পর তার আবেদন বিশ্বজনীন। এই বিশ্বজনীনতার হাত ধরে কবিতা কখনো হয়ে ওঠে আন্দোলনের হাতিয়ার, আবার কখনো সেই কাব্যকলার প্রসাধন ও নির্মাণে সৃষ্টি হয় নতুন কাব্য আন্দোলনের ধারা। সেই ধারা বাংলা ভাষার চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য সহ আধুনিক কালের গীতিকবিতা থেকে গদ্যকবিতা পর্যন্ত সমান তালে বহমান। বিষয় বৈচিত্র্যের অভিনবত্বের পাশাপাশি প্রত্যেক কালের কবিতায় একটি চিরন্তনতার ধারা থাকে। সেই ধারার বিস্তৃতরূপ ধরা পরে নানা প্রেক্ষাপটে, নানা আঙ্গিকে, নানা বিষয় ভাবনায়। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন করণের ফলে

বাঙালি জাতি দ্বিধা বিভক্ত হল। জন্ম হল পূর্ব পাকিস্তান নামে আলাদা এক ভূখণ্ডের; যেখানে বাঙলা ভাষাভাষী মানুষদের সংখ্যা অধিক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্ম নেবার পেছনে ভাষা আন্দোলনের অবদান চিরস্মরণীয়।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস কোন ক্ষণিক ঘটনা নয়। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর থেকে বাঙালি মানসে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তার চরম পরিণতি হল ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে'র উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেছিলেন। ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্না এক সমাবেশে বলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা'। এই সালের শেষ দিকে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলিতে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরদিন ২৭ শে জানুয়ারি ঢাকা সফরে এসে খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টনের এক সমাবেশে 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু' এ কথার পুনরাবৃত্তি করেন। তদানীন্তন পাকিস্তানে শতকরা ৫৬ জনের মুখের ভাষা বাংলা হলেও শতকরা ৭ জনের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১-র মধ্যে ক্রমে জোরালো হয়ে ওঠে বাংলা ভাষার মর্যাদা আদায়ের দাবি। ভাষা আন্দোলন তখন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের এক অন্যতম প্রধান সমস্যায় পরিণত হয়। সেসময় পূর্ব পাকিস্তানের আপামর বাঙালিরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলে জোরালো প্রতিবাদের স্লোগান তোলেন। এভাবে ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯৭১ এর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বীজ বপন হয়েছিল।

ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক তাদের ভাষা আন্দোলন-ইতিহাস ও তাৎপর্য বইয়ে লিখেছেন, "প্রথম লড়াইটা প্রধানত ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ"[১]। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত ভাষা সচেতন মুসলমানেরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, কোন দেশের প্রকৃত পরিচয়ের নিরিখ কেবল ধর্ম হতে পারে না। এই ভূখন্ডের বাঙালি হিন্দু মুসলিম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল উর্দু নয় বাংলা হবে এখানকার রাষ্ট্রভাষা। ১৯৫২ সালের আগে থেকে পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা জোর করে উর্দু ভাষা চপিয়ে দিতে চেয়েছিল এদেশের মানুষদের উপরে। সরকারি ভাষা উর্দু করে বাংলা শিক্ষিত মানুষদের সরকারি চাকুরি সহ সমস্ত ক্ষেত্রে বঞ্চনার মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। বাঙালির সংস্কৃতি চর্চা ও সাহিত্য চর্চাকে বিপন্ন করে সর্বত্র উর্দুর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল। পূর্বোক্ত সৈনিকদ্বয় লিখেছেন, "ভাষা আন্দোলন বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। . . . এর সূচনা মূল আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক দশক আগেই এবং বাঙালি মুসলমানের সেকুলার জাতীয়তাবোধ এর পেছনে কাজ করেছে।"[২] বাংলার সামাজ ও রাজনীতি সচেতন জনগণ শাসকের নীতি প্রত্যাখ্যান করে। ফলে অমানুষিক নিপীড়ন শুরু হয় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ওপর। চলতে থাকে বাঙালির উপর দমন-পীড়ন ও নিধন প্রক্রিয়া। শেষে কেন্দ্রীয় সরকার গণ আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করে এবং ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৯৫২ সালের শুরুতে ভাষা আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। ওই বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ ই ফাল্গুন ১৩৫৮) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে দেশের মানুষ 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' ও সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হয়। পাকিস্তান সরকার আন্দোলন দমন করার জন্য ১৪৪ ধারা জারির মাধ্যমে জনসমাগম, জনসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করে। ভাষা রক্ষার দাবিতে সক্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেয়া ভাষিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল নিয়ে আসেন ঢাকার রাজপথে। ছাত্ররা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙলে পুলিশ গুলি চালায়। শহীদ হন রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, সালামসহ নাম না-জানা অনেকে। ভাষা আন্দোলনের জন্য এই আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। পরদিন সারারাত জেগে শহীদদের স্মরণে গড়া হয় শহীদ মিনার। পুলিশ তা ভেঙে ফেললে পুনরায় গড়ে তোলা হয় শহীদ মিনার। এ শহীদ মিনার একুশের শোক, সংগ্রাম ও শপথের প্রতীক; তা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও জাতিচেতনামূলক আন্দোলনের চালিকাশক্তি হয়ে রয়েছে বাঙালি জীবনে। সেদিন ভাষিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান দেশের প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিকরা। এসব প্রতিবাদ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে সাহিত্য। একুশের আন্দোলন বাঙালিকে দিয়েছে দেশপ্রেমের মহান আবেগ, অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী জীবনবোধ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে চলার প্রাণশক্তি। একুশের বীণায় ঝংকৃত হয়েছে বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র সুর। ভাষা আন্দোলন বাংলা কবিতার অঙ্গনে জন্ম দিয়েছিল সমাজ চেতনায় দায়বদ্ধ অনেক নতুন কবির, যাঁরা নারী ও নিসর্গকে নিয়ে রোমান্টিক ভাবালুতায় মগ্ন না থেকে বাস্তবের মাটিতে নেমে এলেন। তাঁদের কবিতায় লিখলেন রক্ত, অশ্রু আর বেদনার কথা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা।

ভাবিত হলেন সমাজ ও মানুষ, স্বদেশ ও বিশ্বকে নিয়ে, স্বপ্ন দেখলেন মানব-মুক্তির। তাঁদের কবিতায় ফুটে উঠল স্বদেশের রক্তাক্ত ছবি। কবিতা তাঁদের লেখনিতে হয়ে উঠল সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার।

১৯৪৭-১৯৫১ পর্যন্ত সময়ে বাংলা কবিতা ইসলামী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিল। সে কারণে তখন বাংলা কবিতা ক্রমেই নিজস্বতা হারাতে থাকে। ইসলামী সাম্প্রদায়িক চেতনা বাংলা কবিতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এই ধারার কয়েকজন কবি হলেন গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, ছদরুদ্দীন, সুফী জুলফিকার হায়দার প্রমুখ। সমালোচকেরা এইসব কবিদের কবিতাকে বলেছেন প্রগতিবিমুখ, অনাধুনিক এবং অনুর্বর। গবেষকেরা এই সময়কে বলেছেন বাংলা ভাষার ‘সাহিত্যিক-শৈল্পিক বন্ধ্যাত্বের’ যুগ। ভাষা আন্দোলন এই বন্ধ্যাত্ব-মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের চেয়ে মানবতাবোধ, দেশজ উত্তরাধিকার, মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ সর্বপোরি অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী নানা কাব্য আন্দোলন যখন বাংলা কবিতাকে শাণিত করেছিল, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন বাঙালি কবিকুলকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাঙালি জাতির রক্তের বিনিময়ে গড়ে তোলা ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক কবিতার মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রামের ‘সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ’এর আহ্বায়ক এবং ‘সীমান্ত’ পত্রিকার সম্পাদক মাহবুব-উল্-আলম চৌধুরী ২২ ফেব্রুয়ারি রচনা করেন ‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’ কবিতাটি। কোহিনূর ইলেক্ট্রিক প্রেসে গোপনে ছাপা কবিতাটি প্রকাশের পরে মুসলিম লীগ সরকার এটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দীর্ঘ এই কবিতাটি ছিল প্রতিবাদের বিস্ফোরণ। কবি বাঙালির আবেগ আর প্রতিবাদের সাহসী উচ্চারণ শুরু করেছেন এইভাবে:

> “ওরা চল্লিশ জন কিংবা আরো বেশি
> যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে-রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়া
> গাছের তলায়
> ভাষার জন্য, মাতৃ ভাষার জন্য — বাংলার জন্য।”[৩]

সেই ভাষা শহীদদের আত্মদান যে বিফলে যাবে না তার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে এই কবিতায়। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি সচেতন রাজনীতিকেরা প্রাণ দিয়েছেন এদেশের মহান সংস্কৃতিকে বাঁচাতে। আলাওল থেকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল কিংবা জসিমুদ্দিনের বাংলা সৃষ্টিকে বাঁচাতে। পলাশপুরের মকবুল আহমদ, রমেশ শীলের গাথা, বাংলার ভাটিয়ালি, কীর্তন, বাউল, গাথার জন্য চল্লিশটি তরুণ তাজা প্রাণ আত্মবলিদানের মন্ত্র উজ্জীবিত হয়েছিল। কবি জানিয়েছেন,

> “শতাব্দীর সভ্যতার
> সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ,
> সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
> আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি।”[৪]

সচেতন ভবে জানিয়েছেন ভাষার জন্য আবেদন জানাতে আসেননি, এসেছেন খুনি জালিমদের ফাঁসির দাবি নিয়ে। প্রতিশোধের আগুনের উত্তাপ উচ্চারণ দিয়ে সর্বস্তরের বাঙালির দাবি তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আমাদের মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়ে যারা গুলির আঘাতে প্রাণ কেড়ে নিল; কবি তাদের ফাঁসি দাবি করেছেন। যে ক্ষমতাবানদের আদেশে তরুণ যুবকদের তাজা প্রাণ ছিনিয়ে নিল, সেই বিশ্বাসঘাতকদের বিচার চেয়ে ফাঁসির দাবি করেছেন। একুশের ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যে কতটা বেদনার, কতটা যন্ত্রণার, কতটা ক্ষোভের, কতটা নিন্দার তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এই প্রতিবাদী কবিতাটিতে। এরপর বিগত সাতটি দশক ধরে অসংখ্য সৃষ্টিতে ভরে গেছে একুশের সাহিত্যের ডালি।

শুধু মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর নন, বাংলা সাহিত্যে প্রায় সব কবি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দু-একটি কবিতা লিখেছেন। বাহান্নর ২৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে বসে একুশে ফেব্রুয়ারি ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় লিখিছিলেন ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতাটি। এই কবিতা ভাষা শহীদদের স্মৃতি, আত্মত্যাগের ইতিহাস তাদের মাহাত্মকে শুধু বাড়ায়নি, সমগ্র বাঙালরি জাতি সত্তা ও মযার্দা বাড়িয়েছে। কবিতার শুরুতে তিনি লিখেছেন,

"স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো !"[৫]

পাকিস্তানের শাসকের সেনারা গুলির আঘাতে বাংলাভাষী যুবকদের হত্যা করতে পেরেছে কিন্তু চার কোটি পরিবারের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে পারেনি। সমাজের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আমজনতা শাসকের রক্তচক্ষুকে তীব্র কটাক্ষ করেছে এই কবিতায়। তাই তিনি লিখেছেন,

"ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চারকোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।"[৬]

বাংলা মায়ের বুকে শহীদদের নাম রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে, তা সূর্য কিরণের মতো জ্বলজ্বল করে প্রত্যেক বাঙালির মনে। বজ্র কঠিন হাজার মুঠির মত কঠিন শপথের দ্বারা মাতৃভাষা রক্ষক শহীদেরা সূর্য শিখার মতো বাঙালির মনে জেগে থাকবে। শহীদরা মিশে আছে প্রত্যেক বাঙালির রক্ত কণায়। এই রক্তে নির্মিত শহীদ মিনার কোন শাসক কখনো ভেঙে ফেলতে পারবে না --- এই তার অঙ্গীকার।

একুশের ভাষাশহীদ ভাইদের স্মরণে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লিখলেন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতাটি। গেণ্ডারিয়া দুপখোলা মাঠে যুবলীগের একটি অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম এই কবিতাটি আবৃত্তি করা হয়। পরবর্তীতে এটি ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান 'অমর একুশে' কবিতাটি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে লেখা। ১৯৬৩ তে এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিমুখ প্রান্তর'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁরই সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন। একুশের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নাটক ইত্যাদি গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। সংকলনটিতে ১৫ জন কবির ১৫টি কবিতা 'একুশের কবিতা' নামে স্থান পেয়েছে। এই পনের জন কবি হলেন শামসুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গণি হাজারী, ফজলে লেহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্, জামালউদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সিকান্দার আবু জাফর, মাহবুব তালুকদার, আলমাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান।

এই কবিতা সংকলনে গ্রথিত কবিতায় শামসুর রহমান লিখেছেন,

"আর যেন না দেখি কোন কার্তিকের চাঁদ কিংবা
পৃথিবীর কোন হীরার সকাল,
\- - -
আগুনতাঁতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেল আমার দুটি
চোখ —।"[৭]

ভাষা শহীদদের জন্য কবির অন্তরাত্মার কান্না ধ্বনিত হয়েছিল এই কবিতায়। রক্তে ভেজা মাতৃভূমির বুক থেকে যে তরতাজা প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছিল রক্ত পিপাসু শাসকের দল তাদের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন কবি।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লিখেছেন, "অমাবস্যাগাঢ় চোখের একান্ত নীলে
স্বদেশই মিছিল;
স্বপ্নের ধ্বনিগুলি মানুষের দুবাহুতে মিলে;
সমুদ্রের ঢেউ আজো, আকাশের আবেগে আজো নিবিড় সুনীল।"[৮]

ফজলে লেহানীর কবিতায় গ্রামবাংলার মায়ের বুক থেকে শহরে পড়তে আসা ছেলেদের জন্য অপেক্ষার কথা রয়েছে। রয়েছে ভাষা শহীদ যুবকদের জন্য গোটা শহর গ্রামে নিস্তব্ধতার ছবি। শহরের মজুর, শ্রমিক, কর্মী, দোকানী থেকে আকাশ বাতাস এক আসীম নিস্তব্ধতায় ডুবে রয়েছে। কবি লিখেছেন,

"শীতল পৃথিবী, অবশ নগর,
অসার আকাশ, বাতাস নিথর,
ফুটপাতে সব ছড়িয়ে আছে জীবনের সব রেণুকণা যত।"[৯]

মায়ের কোল খালি করে যে ছেলে আত্মবলিদান দিয়েছে শহরের রাজপথে, সেই ছেলের জন্য তার মা আজও অপেক্ষা করে চলেছে নিরন্তর।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌র কবিতায় শুনতে পাই ছেলের জন্য মায়ের দীর্ঘ অপেক্ষার কথা। মা খোকার জন্য ডালের বড়ি, উড়কি ধানের মুড়কি, বিন্নি ধানের খই ভেজে প্রতীক্ষা করছে। মায়ের চিঠি পকেটে নিয়ে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়েছে তরুণ তাজা প্রাণ। মায়ের অন্তর কেঁপে উঠেছে অচকিতে। বাঙালি মায়ের হৃদয়ের আর্তি যেন নিঃশব্দে কেঁদে উঠেছে। ভাষার প্রতি ভালবাসায় পুত্র যে প্রাণ দিয়েছে তার গভীর ছায়াপাত ঘটেছে কবিতায়। প্রায় একই ভাবনায় কবি জামালউদ্দিন লিখেছেন, "বুলেটের মুখে কচি তাজা প্রাণ বিলীন হলো।

বেলুনের মতো ফুসফুসগুলো চুপসে গেলো।"[১০]

হাসান হাফিজুর রহমান ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদের সম্পর্কে গভীর অন্তর্বেদনায় লিখেছেন,

"তেমনি পঞ্চাশটি শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুকে ভুলেছি
মা, তোমাকে পেয়েছি বলে।"[১১]

এভাবে পনেরো জন কবি তাদের অন্তরের গভীর ভাববিহ্বল বেদনাঘন অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এরপর থেকে প্রতি বছর একুশ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়ে চলেছে অজস্র সংকলন। একুশের সাংস্কৃতিক চেতনার অসামান্য ফসল ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা, গবেষণা ও বিকাশে তথা জাতীয় জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অসামান্য। মনে রাখতে হবে সেসময় বর্তমানের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। কিন্তু ঐ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক অস্থিরতা সদ্য বিচ্ছিন্ন ভারতের বিশেষত পশ্চিম বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি ও চিন্তার জগৎকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার কাব্য কবিতার জগতে দুই ধারার বিকাশ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু একথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে, ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মানসে যে চৈতন্যোদয় ঘটেছিল তার চরম পরিণতিতে বাঙালি জাতি পেয়েছিল নিজের দেশ ও ভাষাকে। কাব্য কবিতার নদী বয়ে চলেছিল অন্য স্রোতে।

ভাষা আন্দোলন নিয়ে বিশিষ্ট সংকলন হল বাংলা একাডেমি-প্রকাশিত 'একুশের কবিতা'। একাডেমি ১৯৮৩ সালে এটি প্রথম প্রকাশ করে। ১৯৫৩ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত একুশ নিয়ে লেখা ১১৫ জন কবির ১৩২টি কবিতা এতে সংকলিত হয়। সংকলনের কবিতাগুলি বাংলা ও ইংরেজি - এই দুই ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে : জসীমউদ্দীনের 'একুশের গান', সুফিয়া কামালের 'এমন আশ্চর্য দিন', আহসান হাবীবের 'একুশে ফেব্রুয়ারী', ফররুখ আহমদের 'ভাষা আন্দোলনের নিহত আত্মার প্রতি', আবুল হোসেনের 'তোমাকে নিয়ে যত খেলা', সানাউল হকের 'অমর একুশে', আবদুল লতিফের 'একুশের গান', শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', সৈয়দ শামসুল হকের 'একুশের কবিতা', মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'একুশের গাথা', ফজল শাহাবুদ্দীনের 'আত্মা থেকে একটি দিন', আল মাহমুদের 'একুশের কবিতা', দিলওয়ারের 'একুশের কবিতা', আবু হেনা মোস্তফা কামালের 'একুশের কবিতা', বেলাল চৌধুরীর 'বর্ণমালার নিরস্ত্র সাহস', হায়াৎ মামুদের 'ঘুরে ফিরে ফাল্গুন', শহীদ কাদরীর 'একুশের স্বীকারোক্তি', রফিক আজাদের 'পঞ্চানন কর্মকার', আসাদ চৌধুরীর 'ফাল্গুন এলেই', আবদুল মান্নান সৈয়দের 'একুশে ফেব্রুয়ারী', মোহাম্মদ রফিকের 'মহান একুশে', মহাদেব সাহার 'তোমরা কী জান', নির্মলেন্দু গুণের 'আমাকে কী মাল্য দেবে দাও', হুমায়ুন আজাদের 'বাংলা ভাষা', আবুল হাসানের 'মাতৃভাষা', মাহবুব সাদিকের 'অবিনাশী বাংলা', আবুল মোমেনের 'আমি কি ভুলিতে পারি', অসীম সাহার 'মধ্যরাতের প্রতিধ্বনি', মুহম্মদ নূরুল হুদার 'মাতৃভাষা' ইত্যাদি। একুশ-পরবর্তী অর্ধশত বছরে বাংলাদেশের কবিদের সত্তায় প্রবহমান একুশের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে এসব কবিতায়।

কবি শামসুর রাহমান পরবর্তীতে লিখেছিলেন 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতাটি। এখানেও গভীর মানব জীবন প্রীতির পাশে ফিরে এসেছে একুশে ফেব্রুয়ারির কথা। নানির ডালের বড়ি দিতে দিতে বিষাদ সিন্ধুর গান আর একুশের প্রথম প্রভাত ফেরির অলৌকিক ভোর কবিকে পুরাতন স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান কাল পর্যন্ত এরকম অনেক উল্লেখযোগ্য কবিরা রচনা করে চলেছেন ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক মাতৃভাষা প্রীতির কবিতাগুলি। বিগত সাত দশকে ভারত বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক কবিতা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এরকম আরো কয়েকটি সংকলন হল

'একুশের নতুন কবিতা' (আশীর্বাদ প্রকাশনী, ১৯৯২) 'ভাষা আন্দোলনের ছড়া কবিতা' (পালক প্রকাশনী, ১৯৯৫), 'দুই বাংলার একুশের ছড়া সংকলন' (সুমুদ্রণ, ২০০০), 'মহান একুশে' (নবজাতক প্রকাশন, ২০০২), 'অলৌকিক ভোরের কবিতা' (পদাতিক ২০০২), 'রক্তে ভাষা মাতৃভাষা' (রিডার সার্ভিস, ২০০৮) 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (নয়া উদ্যোগ, ২০১১), 'একুশের ছড়া-কবিতা' (কাকলি প্রকাশনী, ২০১২) ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা দরকার ১৯৯১-এর ডিসেম্বরে আমিরুল মোমেনীনের সম্পাদনায় যে 'একুশের সংকলন গ্রন্থপঞ্জি' প্রকাশিত হয়েছে তাতে ২,২৮২ টি সংকলনের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কাব্য কবিতায় এক স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। অতি সম্প্রতি কালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'একুশে ফেব্রুয়ারির ছড়া' (দি সী বুক এজেন্সি, ২০১৯) সংকলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'পৃথিবীর সব ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে'। এখানে নবীন ও প্রবীণের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন সম্পাদক শৈলেন্দ্র হালদার। গ্রন্থে দুই বাংলার মোট ৯৯ জন কবির মাতৃভাষা প্রীতি ও ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনের প্রথম কবিতা 'একুশে ফেব্রুয়ারি'তে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, "গুলির মুখে দাঁড়ায় রুখে

অকাতরে হারায় জান
রক্তে রাঙ্গা মাটির পরে
ওড়ে ওদের জয় নিশান।"[১২]

আবার একই নামের অনেকগুলি কবিতায় আমরা ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন চেতনার কথা শুনতে পাই। যেমনঃ-

অরুণ মিত্র লিখছেন, "একুশে ফেব্রুয়ারি আহা
হৃদয়-ছোঁয়া ডাকে
মাতায় সব বাঙালিকে
দু-পার বাংলাকে।"[১৩]

ওয়াজেদ আলি লিখেছেন, "ভাষার জন্য এমন লড়াই কোথাও হয় নি ভাই
পৃথিবীর ইতিহাসে ভাই বাংলা পেয়েছে ঠাঁই।"[১৪]

দীপ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "ভাষার জন্য শহিদ হয়েছে
বাংলাদেশের ভাইরা
শক্ত যে আজ রক্তে ভিজে
বাংলা ভাষার চাঁইরা।"[১৫]

ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের লিখেছেন, " 'একুশ' মোদের মুখের ভাষা হিরে-মানিক-মরকতের
'একুশ' মানেই-বুকের আশা রফিক-সালাম-বরকতের।"[১৬]

'একুশ আমার' কবিতায় সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন, "একুশ আমার ঘুম পাড়ানো মায়ের গান,
একুশ আমার যুদ্ধে যাবার ধনুক বাণ।"[১৭]

সমগ্র সংকলনটিতে এপার বাংলা ওপার বাংলার কবিদের প্রাণের আবেগ ও ব্যথা বেদনার কথা ধরা পড়েছে গভীর ভাষা প্রীতিতে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে অপর এক ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয় ১৯৬১ সালের ১৯ মে, আসামের বরাক উপত্যকার শিলচরে। সেদিন ১১ জন ভাষা প্রতিবাদীকে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে গুলিবিদ্ধ হতে হয়েছিল। ১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা অসমীয়াকে আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব করেন। ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক রণেন্দ্র মোহন দাস এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। বরাকের বাঙালিদের উপর অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি 'কাছার গণ সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এরা নানা প্রচার, প্রতিবাদ, পদযাত্রা, ধর্মঘট, আন্দোলন শেষে ১৯ মে হরতালের সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘোষণায় ১৮ মে অসম পুলিশ আন্দোলনের তিনজন নেতা নলিনীকান্ত দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন ও বিধুভূষণ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ১৯ মে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে হরতাল ও পিকেটিং চলতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীরা সরকারী কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন, কোর্ট চত্বরে সত্যাগ্রহ চালিয়ে যান। শিলচর স্টেশনে ভাষার দাবিতে সারাদিন ধরে চলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। বিকালবেলা অসম রাইফেলস্ এর জওয়ানেরা সেখানে আসে। স্টেশনের সুরক্ষায় থাকা প্যারামিলিটারী বাহিনী আন্দোলনকারীদের বন্দুক ও লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে। এরপর আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য

করে সাত মিনিটে ১৭ রাউণ্ড গুলি চলে; গুলিবিদ্ধ হন ১২ জন যুবক। সেদিন ১১জন নিহত হন। ২০ মে শিলচরের জনগণ শহীদদের শবদেহ নিয়ে শোক মিছিলে প্রতিবাদ জানায়। শেষে অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ভাষা আন্দোলনের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে প্রতি বছর বরাকসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ১৯ মে 'বাংলা ভাষা শহীদ দিবস' পালিত হয়। ১৯৬১ এর ভাষা আন্দোলনে শহিদ হয়েছিলেন কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রকুমার দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য। ১৯ মে ভাষা আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ যুবক কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস দীর্ঘ ২৪ বছর লড়াই শেষে ১৯৮৫ তে শহীদ হন। এছাড়া ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট আসামের ব্রহ্মপুত্র উপতাক্যয় বাংলা ভাষার জন্য শহীদ হয়েছিলেন বিজন চক্রবর্তী, ডা. মনীষী দাস এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই এর দাঙ্গায় শহীদ হন জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু দাস।

ভাষা আগ্রসনের মুখে দুই দেশের মানুষেরা প্রাণবলিদান করে বাঙালি ও বাংলা ভাষার মহত্বকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আসামের বরাক উপত্যকায় ভাষা শহিদদের অবদানকে স্মরণে রেখে এদেশে ভাষা আন্দোলনের কবিতাগুলি রচিত হয়েছে। বরাকের কবিরা এই সময় অতুল প্রসাদের 'মোদের গরব মোদের আশা/ আ-মরি বাংলা ভাষা...' গানটিকে নিজেদের সমবেত কণ্ঠস্বর বলে ঘোষণা করেছিলেন। কবি বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য, বিমল চৌধুরী, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, অতীন দাশ, দেবেন্দ্র কুমার পাল চৌধুরী, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, দিলীপ কান্তি লস্কর, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, অনুরূপা বিশ্বাস, জন্মজিৎ রায়, বিজয় কুমার ভট্টাচার্য, ছবি গুপ্তা প্রমুখরা ভাষা আন্দোলনের নানা চিত্র এঁকেছেন তাদের কবিতায়।

ভাষা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের পর হৃদয় বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙালি সেদিন অস্তিত্বের সংকট বুঝতে পেরে সংকল্প নিয়েছিল প্রাণ দিয়ে ভাষাকে রক্ষা করবার। কবি অতীন দাশ 'উনিশের জার্নাল' কবিতায় লিখেছেন, "না, জান দেব, তবু জবান দেব না

সহস্র কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল দুর্মদ শপথ
সবাই স্বেচ্ছা সৈনিক, 'আরো প্রাণ দিতে হবে বলিদান।"[১৮]

কবি 'উনিশের দাবি' কবিতায় নবীন প্রজন্মের মনে ১৯ মে ভাষা আন্দোলনের নব রূপের চিত্র এঁকেছেন। আবার এই মুহূর্তে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ভাষা শহিদদের কথা নয়, নিজেদের গৌরবগাথা প্রকাশে ব্যস্ত হয়েছিল। এই ভণ্ড ভাষা প্রেমিকদের উদ্দেশ্যে কবির কথা, "শুধু স্তব্ধতার দাবি একটি দিন,

অমর উনিশে
পবিত্র মুহূর্তগুলো দীর্ণ হয়
বাচাল সংলাপে।"[১৯]

দীর্ঘায়ু কবি দেবেন্দ্র কুমার পাল চৌধুরী বরাকের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল মোহিতলাল প্রমুখ খ্যাতিমান কবিদের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন। কবির বহু কবিতায় ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও বোধ প্রকাশ পেয়েছে। বরাকের ভাষা শহিদদের তিনি বলেছেন 'আলোর দূত'। 'অমর ভাষা শহীদ লহ প্রণাম' কবিতায় লিখেছেন, "তোমরা আসনি জানি ধরণীতে তুচ্ছ সুখ তরে

তোমরা আলোর দূত এসেছিলে,
আঁধারের কুহেলিকা উন্মোচন করে।"[২০]

দিলীপ কান্তি লস্কর উনিশের চেতনায় ঋদ্ধ শিল্পী। অনেকগুলি গদ্য গ্রন্থে তিনি উনিশের ইতিহাস রচনা করেছেন। উনিশের ভণ্ড বাঙালিদের তিনি গালাগাল দিয়েছেন। ভণ্ড ভাষা প্রেমীদের নিয়ে তিনি লিখেছেন 'আমরা বাঙালি' কবিতা। কবির '১৯ শে মে' কবিতার মর্মে মর্মে ধ্বনিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের চলমান প্রতিক্রিয়া। বরাক বাসীর চলমান ভাষা সংস্কৃতিকে অটুট রাখবার স্তম্ভ হল উনিশে মে। উনিশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি লিখেছেন,

"১৯ শে সব চেনার জানার আত্মার দর্পণ
১৯ ই সংগ্রাম, উনিশই জাগরণ...।"[২১]

কবি অনুরূপা বিশ্বাসের ‘তেমন কোন রাবার নেই মোছে উনিশে মে’ কবিতায় ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় উনিশে মে’র চেতনা ধরা পড়েছে। মাতৃভাষার মধ্যে মানুষের যে চেতনা ও ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ মেলে অন্যের ভাষা অসমীয়াতে তা দুর্লভ। কবি তাই লিখেছেন, “কেন? আমার ভাষাটা হেসে ছেড়ে দেবো?

যে ভাষা শেখাবে, চাপে শিখে নেবো?
আমি কি ময়না?
যে ভাষা শেখাবে শিখে শোভা হব পিঞ্জরের।”[২২]

এছাড়াও তার ‘উনিশে মে আয়ুষ্মান হও’, ‘অদ্ভুত আঁধার এক’, ‘প্রথম সমুদ্র দর্শন’, কবিতাতে উনিশের চেতনা ধরা পড়েছে। ‘১৯শে মে ৬৫’ তে একষট্টির ভাষা আন্দোলনের বিচিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে। এভাবেই উনিশে মে আর একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন যেন একাকার হয়ে গেছে বরাকের কবিদের কবিতায়। ভাষা জননীর দুঃখ, অপমান যন্ত্রণা, ব্যথা বেদনার আঘাতে জর্জরিত কবি লিখেছেন,

“অমর বাংলা ভাষা, তুমি আমার জননী যন্ত্রণা কেবলি,
সয়ে যাওয়া দুঃখ আর অপমান
কপট অন্ধকারে অবিরাম হিংসার ছোবল
তোমার পিঠের বেদম মারের কালশিটের দাগ
মোছে না।”[২৩]

সর্বোপরি তার কবিতায় শহীদের আত্মবলিদানের কথার পাশাপাশি এসেছে পরবর্তীতে তাদের অবস্থার নানা চিত্র। বিশ্বের প্রথম নারী ভাষা শহীদ কমলা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কবির ছিল প্রত্যক্ষ পরিচয়। এই শহীদের পরিবারের হাহাকার যেন মিশে রয়েছে নিজের রক্তে। সেই হাহাকারের মর্ম বিদারি ছবি এঁকেছেন কবিতায়।

কবি দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যের অনেক কবিতায় ভাষা আন্দোলনের ছাপ স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে তাঁর ‘মাতৃভাষা: ৬১- ৭৪’, ‘১৯৭৯-৮০’ এবং ‘শহীদের আত্মকথা’ কবিতা তিনটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনটি কবিতাতে ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ ও সময়ের সঙ্গে বরাকবাসীর মানসিক পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন।

উনিশের চেতনায় আলোড়িত আর একজন কবি ছবি বিশ্বাস। তাঁর ‘উনিশে মে’ কবিতায় বাংলা ভাষার আত্মপরিচয়ের সংকটের কাল বলে অভিহিত করেছেন। সাইত্রিশের যৌবনে দাঁড়িয়ে কবি লিখেছেন,

“উনিশে মে বলো কোথা রাখি
তোমার সাইত্রিশ রক্তাক্ত যৌবন?”[২৪]

‘কবিতা কন্যা’ কবিতায় ভাষার উপর নির্যাতনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিগুরুর একশতম জন্মদিনের মাসে ভাষার জন্য নিহত হতে হল কমলা ভট্টাচার্যকে। এই তরুণীর আত্মত্যাগের মধ্যে কবিতা কন্যা তথা বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের মানসী নারী চেতনা এক হয়ে গেছে। কবি লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষার কবিতা কন্যা

এই বরাকে ভাষা শহিদ কড়া নাড়ে দরজায়।”[২৫]

কবি মহুয়া চৌধুরীর কবিতা ‘অন্তত উনিশে মে’ তে ভাষা আন্দোলনের ছবি চিরন্তন রূপ পেয়েছে। যুগ যুগ ধরে উনিশে মে ফিরে আসবে। কিন্তু এর গৌরব কখনো ম্লান হবে না। নবীন প্রজন্মের কাছে ভাষা শহিদদের মর্যাদা নব নব রূপে উন্মোচিত হবে এই আশা তিনি পোষণ করেন কবিতায়। ‘ভাষাময় চৈতন্যের পরশ’ কবিতায় কবি চেতনায় ভাষাবোধের অস্তিত্বকে প্রাণ-চেতনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ‘স্মরণীয়’ কবিতায় শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি বিজয় কুমার ভট্টাচার্য। তাঁর কবিতায় উনিশে মে’র স্মৃতি ছাড়াও ফিরে এসেছে ৭২ সালের সতেরো আগস্ট এবং ৮৬ সালের একুশে জুলাই এ বরাকে পুনর্বার বাংলা ভাষা রক্ষায় শহিদদের কথা। তাঁর ‘১৯শে মে’, ‘উনিশ একুশ’ কবিতায় যেন ফিরে এসেছে দুই বাংলার ভাষা আন্দোলনের ছবি। জন্মজিৎ রায় ভাষা আন্দোলনের গভীর রেখাপাত ঘটিয়েছেন তার কবিতায়। এভাবে দুই বাংলার ভাষা আন্দোলন বাংলা কবিতার পথ প্রশস্ত করে চলেছে নিরন্তর।

বাহান্ন পরবর্তী বাঙালির জাতীয় জীবনে, সামগ্রিক চেতনায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব কেবল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পড়েনি, একুশের মহিমা দুই দেশের বাংলা সাহিত্যেও বারবার উচ্চকিত হয়ে আসছে। ভাষা আন্দোলন প্রেক্ষাপট থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হতে পেরেছে। কবিতার কাব্য ভাষায় বাহান্নের

একুশ এবং একষট্টির উনিশ তারিখ দুটি সর্বদা প্রাণময়, চেতনাদীপ্ত ও চিরনবীন। সমকাল বা পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার এমন পদ্য অথবা গদ্যশিল্পী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যিনি এই প্রেক্ষাপটে অনুরণিত হয়ে কবিতা বা গদ্য রচনা করেননি। কাব্য কবিতায় সর্বদা প্রেক্ষাপটের পুনঃব্যবহারে ভাষা আন্দোলন ঘুরে ফিরে এসেছে। শেষ করব অমিতাভ দাশগুপ্ত'র 'উনিশে মে আর একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে যেখানে ভাষা আন্দোলন বিশ্বজনীনতার রূপ পেয়েছে। কবির ভাষায়,

"বুকের রক্ত মুখে তুলে যারা মরে
ওপারে ঢাকায় এপারের শিলচরে
তারা ভালোবাসা-বাংলাভাষার জুড়ি—
উনিশে মে আর একুশে ফেব্রুয়ারি।"[২৬]

তথ্যসূত্র:

১. https://www.bbc.com/bengali/news-51550921
২. https://www.bbc.com/bengali/news-51550921
৩. http://akashleena.org/Kadte%20Ashini.pdf
৪. http://akashleena.org/Kadte%20Ashini.pdf
৫. http://kobita.banglakosh.com/archives/753.html
৬. http://kobita.banglakosh.com/archives/753.html
৭. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.266275/page/n30/mode/1up
৮. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.266275/page/n32/mode/1up
৯. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.266275/page/n35/mode/1up
১০. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.266275/page/n47/mode/1up
১১. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.266275/page/n63/mode/1up
১২. 'একুশে ফেব্রুয়ারির ছড়া', শৈলেন্দ্র হালদার(সম্পাদক), দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ১৩।
১৩. ঐ, পৃ. ২৩।
১৪. ঐ, পৃ. ৪১।
১৫. ঐ, পৃ. ৫৩।
১৬. ঐ, পৃ. ৭৭।
১৭. ঐ, পৃ. ১০৩।
১৮. উনিশের কবিতা, অতীন দাশ (সম্পা.), ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, প্রথম প্রকাশ ২০১১ পৃ. ২৩।
১৯. ঐ, পৃ. ২৯।
২০. ঐ, পৃ. ১০৬।
২১. ঐ, পৃ. ৪৬।
২২. ঐ, পৃ. ৪২।
২৩. 'উনিশে মে আয়ুষ্মান হও', অনুরূপা বিশ্বাস, বরাক নন্দিনি প্রকাশনী, অম্বিকাপট্টি, শিলচর, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃ. ৮-৯।
২৪. উনিশের কবিতা, অতীন দাশ (সম্পা.), ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, প্রথম প্রকাশ ২০১১ পৃ. ২৩।
২৫. ঐ, পৃ. ২৬।
২৬. https://www.kobitacocktail.com/উনিশেমে-একুশে-ফেব্রুয়ারি।